بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ মোতাবেক ১৫ ফাতাহ্, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর সীরাত বা জীবনচরিতের বরাতে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছিল। এর বিশদ বিবরণ হলো, মহানবী (সা.) যখন উহুদের প্রান্তরে ঘাঁটি স্থাপন করেন তখন মুসলমান সেনাদলের পেছনদিকে ছিল উহুদ পাহাড়, যে কারণে মুসলমান সেনাদল পেছন হতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থেকে নিরাপদ ছিল। অবশ্য একদিকে পাহাড়ি গিরিপথ ছিল। আর এই স্থানটি এমন ছিল যে, শত্রু সুযোগ পেলে এই স্থান থেকে আক্রমণ করতে পারতো। তাই, মহানবী (সা.) এই স্পর্শকাতরতা ও আশংকা উপলব্ধি করে পঞ্চাশজন তিরন্দাজ সাহাবীর একটি দলের ওপর আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং সেই গিরিপথে মোতায়েন করেন। এই তিরন্দাজদের মহানবী (সা.) যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বুখারীতে এই বাক্যাবলি বিদ্যমান রয়েছে।

إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ، فَلاَ تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

অর্থাৎ, **'তোমরা যদি দেখো যে, পাখিরা আমাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি আমার কাছ থেকে বার্তা প্রেরণ না করা পর্যন্ত তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না। পক্ষান্তরে তোমরা যদি দেখো যে, আমরা শত্রু জাতিকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তবুও আমি তোমাদের কাছে কোনো পয়গাম না প্রেরণ করা পর্যন্ত তোমরা (স্ব-স্থান) ত্যাগ করবে না।'** বুখারী শরীফেরই আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমরা যদি দেখো আমরা তাদের ওপর জয়যুক্ত হয়েছি তথাপি তোমরা (এই) স্থান পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দেখো যে, তারা আমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে তবুও তোমরা নিজেদের (স্থান থেকে) সরবে না। তোমরা আমাদের সাহায্য করতে এসো না। কোনো অবস্থাতেই তোমরা (এই স্থান) ত্যাগ করবে না।'**

একজন জীবনীকার লিখেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তোমরা শত্রুদের অশ্বারোহী দলকে আমাদের থেকে দূরে রাখবে, যেন তারা আমাদের পেছন দিক থেকে আক্রমণ রচনা করতে না পারে। আমাদের জয় হলেও তোমরা নিজেদের স্থানে অনড় থাকবে, যেন তারা আমাদের পেছন দিক থেকে আসতে না পারে। তোমরা নিজেদের স্থানে অটল থাকবে, সেখান থেকে সরবে না। আর তোমরা যদি দেখো যে, আমরা তাদেরকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদের সৈন্যব্যূহে ঢুকে পড়েছি তবুও**

তোমরা নিজেদের স্থান ত্যাগ করবে না। আর তোমরা যদি দেখো যে, আমরা নিহত হচ্ছি, তবুও আমাদের সাহায্যে (এগিয়ে) আসবে না এবং আমাদের রক্ষণাবেক্ষণও করবে না। আর তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করবে, কেননা তির নিক্ষেপের কারণে ঘোড়া সম্মুখে অগ্রসর হয় না। নিশ্চিৎ জেনো আমরা ততক্ষণ বিজয়ী থাকব যতক্ষণ তোমরা নিজেদের স্থানে অনড় থাকবে।' এরপর বলেন, **'হে আল্লাহ্! আমি তোমাকে এদের ওপর সাক্ষী রাখছি।'** একজন লেখক লিখেছেন, মহানবী (সা.) এ সময় বলেন, **'(তোমরা) যদি দেখো যে, আমরা মালে গণিমত একত্রিত করছি তবুও আমাদের সাথে যোগ দিবে না। সর্বাবস্থায় আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে অবিচল থাকবে।'**

আরেকজন জীবনীকার পঞ্চাশজন তিরন্দাজের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, **যে ব্যক্তির রণক্ষেত্র দেখার এবং সেই কিনাহ্ উপত্যকার প্রান্তে অবস্থিত রোমা পর্বতের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ হয়েছে সে মহানবী (সা.)-এর সুমহান সেই সামরিক দূরদর্শিতার কথা জানতে পারবে, যার মাধ্যমে তিনি সমর পরিকল্পনা এবং সামরিক শক্তিকে সুবিন্যস্ত করার ব্যাপক দক্ষতা এবং যুদ্ধের জন্য সেনাদের প্রস্তুত করার সবচেয়ে উত্তম সময় নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছিলেন অনন্য যা যুদ্ধ-জয়ের জন্য আবশ্যক।**

একজন লেখক মহানবী (সা.)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ রণকৌশলের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই রণকৌশল এত উত্তম ও পরিশীলিত ছিল যে এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর সামরিক নেতৃত্বে অসাধারণ প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। আর প্রমাণিত হয় যে, কোনো সেনাপতি যত মেধাবীই হোক না কেন, মহানবী (সা.)-এর চাইতে অধিক সূক্ষ্ম, পরিশীলিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ রণপরিকল্পনার ছক আঁকতে পারবে না। রণক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাঁর সেনাদের জন্য রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই স্থান নির্বাচন করেছিলেন যেটি যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম স্থান ছিল। তিনি (সা.) পাহাড়ের উচ্চতাকে প্রতিবন্ধক বানিয়ে নিজেদের পশ্চাৎ এবং ডানদিক সুরক্ষিত করে নেন এবং বাম দিক থেকে একমাত্র গিরিপথ অর্থাৎ যেই পথ দিয়ে শত্রু ইসলামী সেনাদলের পশ্চাৎভাগে পৌঁছতে পারত– সেটিকে তিরন্দাজদের মাধ্যমে বন্ধ করে দিয়েছিলেন, আর শিবির স্থাপনের লক্ষ্যে তুলনামূলকভাবে ময়দানের উঁচু স্থানকে নির্বাচন করেন। আল্লাহ্ না করুন, যদি অনাকাঙ্ক্ষিত পরাজয়ের শিকার হতে হয় তাহলে পলায়ন করা এবং পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হাতে আটক হওয়ার পরিবর্তে ইসলামী সেনাদল যেন নিরাপদ আশ্রয়স্থল পর্যন্ত অতি সহজেই পৌঁছতে পারে, আর শত্রু যদি সেনাব্যুহ ভেদ করে ইসলামী সেনাদলের কেন্দ্র দখল করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয় তাহলে তাদের যেন ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অপরদিকে মহানবী (সা.) শত্রুদের উন্মুক্ত প্রান্তরে ঢালু স্থানে অবস্থান নিতে বাধ্য করেন। অথচ কুরাইশের ধারণা ছিল, ইসলামী সেনাদল মদীনা থেকে বের হয়ে একেবারে তাদের মুখোমুখি (উন্মুক্ত) প্রান্তরে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবে। কিন্তু মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাদলকে অর্ধবৃত্তে প্রদক্ষিণ করিয়ে, শত্রুদের পশ্চিম দিকে ছেড়ে দিয়ে তাদের পেছনদিকের সুরক্ষিত স্থানকে বেছে নেন। যেস্থানে ইসলামী সেনাদল

অবস্থান নিয়েছিল সেটি তখন একটি অতি উত্তম অবস্থানে ছিল। উহুদ এবং আয়নাঈন পাহাড়ের কারণে পশ্চাৎভাগ এবং ডান দিক সুরক্ষিত ছিল। বাম দিকে রোমা পাহাড়ে তিরন্দাজরা গিরিপথ আগলে রেখেছিল এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক যেটি রোমা পর্বতের সম্মুখে ছিল, সেখানে কিনাহ্ উপত্যকার উল্লম্ব বা খাড়া প্রান্ত ছিল, সেখান থেকে শত্রুর আক্রমণ অসম্ভব ছিল।

এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) ও লিখেছেন। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যের প্রতি ভরসা রেখে অগ্রসর হন এবং উহুদের প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করেন। এমনভাবে (শিবির) স্থাপন করেন যে, উহুদের পাহাড় মুসলমানদের পশ্চাৎভাগে থাকে আর মদীনা থাকে সামনে। এভাবেই তিনি (সা.) সেনাদলের পশ্চাৎভাগ সুরক্ষিত করেন। পেছনের পাহাড়ে একটি গিরিপথ ছিল যেখান থেকে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। এর সুরক্ষার জন্য তিনি (সা.) আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়ের (রা.)'র নেতৃত্বে ৫০জন তিরন্দাজ সাহাবীকে সেখানে মোতায়েন করেন এবং তাদেরকে তাকিদ দিয়ে বলেন, যা কিছুই হোক না কেন– তারা যেন কোনো অবস্থাতেই সেই স্থান ত্যাগ না করেন আর শত্রুর ওপর যেন উপর্যুপরি তির নিক্ষেপ করতে থাকেন। তিনি (সা.) এই গিরিপথ সুরক্ষিত রাখার বিষয়ে এতটা সতর্ক ছিলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে বারংবার নির্দেশ প্রদান করেন যে, 'দেখো! এই গিরিপথ যেন কোনো অবস্থাতেই অরক্ষিত না থাকে। এমনকি তোমরা যদি দেখো যে, আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে আর শত্রুরা পশ্চাৎপদ হয়ে পলায়ন করছে তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবে না। আর তোমরা যদি দেখো যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে আর শত্রুরা আমাদের ওপর বিজয় অর্জন করেছে তবুও তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না।' এমনকি একটি রেওয়ায়েতে এই বাক্যও বিদ্যমান যে, 'তোমরা যদি পাখিদের আমাদের মাংস ছিঁড়ে খেতে দেখো তবুও তোমরা এই স্থান পরিত্যাগ করবে না, যতক্ষণ তোমাদেরকে এই স্থান ছেড়ে আসার নির্দেশ দেওয়া না হয়।'

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ বিষয়ে বলেন, অবশেষে তিনি (সা.) উহুদে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি (সা.) একটি পাহাড়ি গিরিপথের সুরক্ষার জন্য পঞ্চাশজন সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং সেই সৈন্যদলের সেনাপতিকে তাকিদ দিয়ে বলেন, 'এই গিরিপথ এতটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা নিহত হই বা বিজয়ী হই– তোমরা এই স্থান থেকে নড়বে না।' এরপর তিনি বাকি সাড়ে ছয়শ সৈন্য নিয়ে শত্রুদের মোকাবিলার জন্য বের হন যা শত্রুসৈন্যের প্রায় এক পঞ্চমাংশ ছিল।

তিরন্দাজ দলকে পাহাড়ের ওপর নিযুক্ত করার পর মহানবী (সা.) আশ্বস্ত হয়ে যান এবং সারি বিন্যাস করতে থাকেন আর অফিসারদের দায়িত্ব বণ্টন করতে থাকেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে কাফেরদের তুলনায় মুসলমানদের অবস্থা অনেক দুর্বল ছিল। সংখ্যার দিক থেকেও দুর্বল, (যুদ্ধের) সাজসরঞ্জামের দিক থেকেও দুর্বল, উত্তম অস্ত্রের দিক থেকেও দুর্বল। উভয়পক্ষে এক্ষেত্রে অনেক ব্যবধান ছিল। সংখ্যাগত দিক থেকে একজন মুসলমানের বিপক্ষে ন্যূনতম চারজন মুশরিক ছিল। অনুরূপভাবে

অশ্বারোহী দলের অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকেও মুশরিক বাহিনী ছিল স্বতন্ত্র অবস্থানে। অধিকন্তু ইসলামী বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক বর্মহীন ছিল আর তাদের মাঝে কেবল একশ বর্মধারী ছিল। অথচ মক্কার বাহিনী অর্থাৎ কাফেরদের বাহিনীতে সাতশ বর্মধারী ছিল, আর এই সংখ্যা মদীনার পুরো বাহিনীর সমান ছিল। মুশরিকদের বাহিনী নিজেদের সেনাবাহিনীকে দশটি সারিতে সাজিয়ে রেখেছিল। অপরদিকে ইসলামী বাহিনীর কেবল দুটি সারি ছিল আর পঞ্চাশজন তিরন্দাজ গিরিপথ পাহারায় মোতায়েন ছিল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদৃঢ় স্থানটি মুসলমানদের দখলে ছিল। মহানবী (সা.) সেনাবাহিনীর ডান বাহুতে হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে আর বাম বাহুতে হযরত মুনযের বিন উমর গানামীকে নিযুক্ত করেন আর জিজ্ঞেস করেন, মুশরিকদের পতাকা কে বহন করছে? উত্তর দেয়া হয় যে, তালহা বিন আবি তালহা। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে অধিক অধিকার রাখি' এবং পতাকা হযরত আলীর কাছ থেকে নিয়ে মুসআব বিন উমায়েরকে দান করেন। তার সম্পর্কও একই গোত্রের সাথে অর্থাৎ বনু আব্দুদ্ দার বিন কুসাই-এর সাথে ছিল যাদের মধ্য থেকে একজন কুরাইশদের পতাকাবাহক ছিল। অর্থাৎ যে গোত্রের লোক কুরাইশদের পতাকা বহন করছিল সেই একই গোত্রের মুসলমানের হাতে তিনি (সা.) নিজের পতাকা তুলে দেন। লেখক লিখেন যে, ইসলামের পূর্বে পতাকা বহনের দায়িত্ব এই বংশেরই স্কন্ধে অর্পিত ছিল, অর্থাৎ বনু আব্দুদ্ দার এর দায়িত্বে ছিল। আর প্রতিশ্রুতি পালনের অর্থ হলো কুসাই এর প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ জাতীয় বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি পালন যার সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন যে, 'আমরা প্রতিশ্রুতি পালনকারী'। আর সেদিন মুসলমানদের নারাধ্বনি বা সংকেত ছিল 'আমিত, আমিত'। মহানবী (সা.) কাকুতি-মিনতির সাথে খোদা তা'লার কাছে সবিনয়ে ও বিগলিতচিত্তে বিজয় ও সফলতার জন্য দোয়া করছিলেন। ইসলামী বাহিনীর সারিগুলোতে আনসাররা ডানে ও বামে ছিলেন। অর্থাৎ ডানদিকে ও বামদিকে মদীনার আনসাররা ছিল আর সেনাবাহিনীর মধ্যভাগ, যেখানে যুদ্ধের সময় শত্রুদের পূর্ণ জোর থাকে সেখানে মহানবী (সা.) মুহাজিরদের সাথে উপস্থিত ছিলেন। অর্থাৎ তখন মধ্যভাগে তিনি (সা.) ছিলেন মুহাজিরদের সাথে। তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল ছিল দ্বিতীয় সারির পেছনে একেবারে মধ্যভাগে। তিনি (সা.) যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন তা ছিল প্রথম সারির ঠিক পেছনে দ্বিতীয় সারির মাঝখানে। তিনি (সা.) সাহাবীদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, আমার পক্ষ থেকে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন আক্রমণ না করা হয়। সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস হতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) উহুদের দিন এই দোয়া করছিলেন যে,

اللهمَّ إنك إن تشاءْ لا تُعبدْ في الأرضِ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! যদি তুমি চাও তাহলে পৃথিবীতে (আর) তোমার ইবাদত করা হবে না। অর্থাৎ যদি তুমি সাহায্য না করো তাহলে এই অবস্থাই হবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটি বর্ণিত

হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের দিন উক্ত দোয়া করেছিলেন, সেখানেও এটি বর্ণিত হয়েছিল। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যে, হতে পারে উভয় উপলক্ষ্যেই তিনি (সা.) এই দোয়া করেছিলেন। বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ (রা.) বলেন, তুমি আমার সাথে এসো, আমরা একসাথে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করব। তারা একটি পৃথক স্থানে চলে যান। এরপর হযরত সা'দ (রা.) এভাবে দোয়া করেন যে, 'হে আমার প্রতিপালক! আগামীকাল যখন আমাদের সাথে শত্রুদের লড়াই হবে তখন আমি যেন এক শক্তিশালী যোদ্ধার মুখোমুখী হই। আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে লড়াই করব আর সে-ও যেন আমার সাথে লড়াই করে। এরপর তুমি আমাকে তার ওপর বিজয় দান কোরো। আমি যেন তাকে হত্যা করতে পারি এবং তার মালামাল আমার হস্তগত হয়।' এরপর আবদুল্লাহ্ বিন জাহশ (রা.) দণ্ডায়মান হন এবং তিনি এভাবে দোয়া করেন যে, "হে আল্লাহ্! আগামীকাল আমার লড়াই যেন এমন কারো সাথে হয়, যে হবে অনেক শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। আমি যেন তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার সাথে যুদ্ধ করতে পারি আর সে আমার সাথে লড়বে। এরপর সে যেন আমাকে ধরে আমার কান ও নাক কেটে দেয়। এরপর আগামীকাল যখন আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব তখন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, 'হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার কান ও নাক কেন কাটা পড়েছে?' তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ্! তোমার এবং তোমার রসূলের (সা.) সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার সাথে এমনটি হয়েছে। তখন আল্লাহ্ আমাকে বলবেন, 'হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছ'।" হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, 'হে আমার পুত্র! আবদুল্লাহ বিন জাহশ (রা.)'র দোয়া আমার দোয়া থেকে উত্তম ছিল। আমি সেদিনই সন্ধ্যায় আবদুল্লাহ্র কান ও নাক এক সুতায় ঝুলতে দেখেছি।' অর্থাৎ শত্রুরা তার অঙ্গচ্ছেদ করেছিল। [তারা উভয়ে যে যে দোয়া করেছিলেন সেসব দোয়া গৃহীত হয়। একজন শত্রুর ওপর বিজয় লাভ করেন, অন্যজন প্রচণ্ড লড়াই করার পর অবশেষে শহীদও হন। যাহোক এই ছিল তাদের দুজনের দোয়ার ঘটনা।] এরপর লেখা আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম বর্ণনা করেন যে, আমি উহুদের একদিন পূর্বে মুবাশ্বের বিন আব্দুল মুনযেরকে স্বপ্নে দেখি। তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলছিলেন– আপনি কয়েকদিনের মাঝেই আমার সাথে মিলিত হতে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় আছেন? তিনি বলেন, জান্নাতে। সেখানে যেদিকে ইচ্ছা ঘোরাঘুরি করি, [অর্থাৎ জান্নাতে]। আমি তাকে বললাম, আপনি কি বদরের যুদ্ধে শহীদ হন নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এরপর আমাকে পুনরায় জীবিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম এই স্বপ্নের উল্লেখ মহানবী (সা.)-এর সমীপে করলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু জাবের! এটি শাহাদাতের সুসংবাদ। যেমন রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, তার পিতা উহুদের দিন শহীদ হয়েছিলেন।

এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা হয়েছে যে, মুশরিকরা **সাবাখা** নামক জায়গায় সারিবদ্ধ হয় এবং যুদ্ধের উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তাদের কাছে দুইশ' ঘোড়া ছিল যেগুলো অগ্রভাগে ছিল। এরপর তারা অশ্বারোহী দলের ডান বাহুতে খালিদ বিন ওয়ালিদ ও বামদিকে ইকরামা বিন আবু জাহলকে নিযুক্ত করে। আর পদাতিক বাহিনীর জন্য সাফওয়ান বিন উমাইয়্যাকে, কারো কারো মতে আমর বিন আস-কে, এবং তিরন্দাজ বাহিনীর জন্য আবদুল্লাহ্ বিন আবি রাবিয়াকে নিযুক্ত করে। এরা সবাই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা তাদের পতাকা তালহা বিন আবি তালহার হাতে দিয়েছিল, যে আবদুদ্ দারের সদস্য ছিল। এটি সেই পতাকার ঘটনা যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, 'আমরা প্রতিশ্রুতি রক্ষার বেশি অধিকার রাখি'; এর কিছুটা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। তালহা বিন আবি তালহাকে পতাকা দেয়া হয়েছিল যে বনু আবদুদ্ দারের সদস্য ছিল। আবু সুফিয়ান বনু আবদুদ্ দারের পতাকাবাহকদের উস্কানি দিয়ে বলে, 'হে বনু আবদুদ্ দার! বদরের দিনেও তোমরাই আমাদের পতাকা বহন করেছিলে। সেদিন আমাদের যে অবস্থা হয়েছে তা তোমরা দেখেছ। মানুষের যুদ্ধের জয়-পরাজয় তাদের পতাকাবাহকদের কারণে হয়ে থাকে। পতাকাবাহক দৃঢ় হলে মানুষের মাঝে মনোবল থাকে। যখন তারা পলায়ন করে তখন মানুষও পলায়ন করে। [অর্থাৎ, যদি পতাকাবাহক পালিয়ে যায় তাহলে মানুষও ভয়ে পালিয়ে যায়।] অতএব, হয় তোমরা আমাদের পতাকা উত্তমরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করো, অন্যথায় আমাদের পথ থেকে সরে যাও। তোমাদের স্থলে আমরাই যথেষ্ট হব।' অর্থাৎ, সে তাদের আত্মাভিমানকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে। তখন তারা বলে, 'আমরা কি আমাদের পতাকা তোমার হাতে তুলে দেবো? অচিরেই যখন আমাদের মোকাবিলা হবে তখন জানতে পারবে– আমরা কী!' সবার শেষে কুরাইশ মহিলাদের তাঁবু ছিল যেখানে তারা ক্রমাগতভাবে দাফ বাজিয়ে বদরের নিহতদের উল্লেখ করে যোদ্ধাদের উচ্ছ্বাস ও আবেগকে উদ্বেলিত করছিল এবং অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাদেরকে উত্তেজিত করছিল।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) এ বিষয়ের বিস্তারিত লিখতে গিয়ে বলেন: নিজেদের পশ্চাৎভাগ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত করে মহানবী (সা.) ইসলামী সেনাদলের কাতার সুবিন্যস্ত করেন এবং বাহিনীর বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিযুক্ত করেন। এ সময় তাঁকে (সা.) অবগত করা হয় যে, কুরাইশের পতাকা তালহার হাতে দেয়া রয়েছে। তালহা সেই বংশের সদস্য ছিল যারা কুরাইশের সর্বোচ্চ পূর্বসূরী কুসায়ী বিন কিলাবের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনার অধীনে যুদ্ধে কুরাইশের পতাকা বহনের অধিকার রাখতো। একথা জেনে তিনি (সা.) বলেন, আমরা জাতীয় বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখি। অতএব তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)'র কাছ থেকে মুহাজিরদের পতাকা নিয়ে মুসআব বিন উমায়ের (রা.)'র হাতে দেন যিনি সেই বংশের এক সদস্য ছিলেন, যে বংশের সদস্য তালহা ছিল। অপর দিকে কুরাইশের সেনাদলেও কাতার সুবিন্যস্ত করা হয়ে গিয়েছিল। আবু সুফিয়ান ছিল সেনাপতি, ডান পাশের কমান্ডার ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ

এবং বাম পাশের ছিল ইকরামা বিন আবু জাহল। তিরন্দাজরা ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন রবীয়্যার নেতৃত্বাধীন। মহিলারা সেনাদলের পশ্চাৎভাগে দাফ বাজিয়ে বাজিয়ে এবং রণসঙ্গীত গেয়ে পুরুষদেরকে উত্তেজিত করছিল।

যাহোক, উভয় দলের যখন কাতার সুবিন্যস্ত করার কাজ চলছিল তখন আবু সুফিয়ান আনসারী মুসলমানদের উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছিল, 'হে অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! তোমরা আমাদের ও আমাদের বংশের লোকদের মাঝ থেকে সরে যাও। তোমাদের সাথে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই।' তখন আনসাররা আবু সুফিয়ানকে অনেক ভর্ৎসনা করে এবং তাকে অভিশাপ দেয়। যথারীতি যুদ্ধ শুরু হয়। সর্বপ্রথম যুদ্ধের সূচনা করে 'ফাসেক' আবু আমের। তাকে জাহেলিয়্যাতের যুগে 'রাহেব' (তথা সন্ন্যাসী) বলে ডাকা হতো। মহানবী (সা.) তার নাম রাখেন 'ফাসেক'। এই ব্যক্তি মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কা চলে যায় এবং কুরাইশকে সে বলতো, আমি যখন আমার জাতির সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করব তখন পুরো জাতি আমার সাথে এসে যোগ দেবে। [এটি তার ভুল ধারণা ছিল যে, আমি যখন তোমাদের সাথে সেখানে যাব তখন নিজের নাম উচ্চারণ করলে আনসাররা মুসলমানদের পরিত্যাগ করে আমার দলে যোগ দেবে।] যাহোক, সে তার নিজ জাতির পঞ্চাশজন সঙ্গী নিয়ে আবির্ভূত হয়। বলা হয়, তার সাথে পনেরোজন লোক মক্কা থেকে গিয়েছিল আর অন্যান্যদেরকে সে বিভিন্ন গোত্র থেকে একত্রিত করেছিল অথবা তারা মক্কাবাসীর ক্রীতদাস ছিল। সে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, হে অওস গোত্রের লোকেরা! আমি আবু আমের। তখন আনসাররা বলে, হে ফাসেক! আল্লাহ্ করুন, তোর চোখ যেন প্রশান্ত না হয়। আনসারদের এই উত্তর শুনে সে বলল, আমি যাওয়ার পর আমার জাতি রাহুকবলিত হয়েছে। এরপর সে তুমুল যুদ্ধ করে এবং তাদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে।

আবু আমেরের পুত্র হযরত হানযালা (রা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজ পিতাকে নিজ হাতে হত্যা করার অনুমতি চাইলেন কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। [যুদ্ধাবস্থা থাকা সত্ত্বেও তিনি (সা.) বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত রাখতে বলেন যে, 'না, তুমি হত্যা করবে না! তাকে হত্যা করলে অন্য কেউ করবে।] অতএব আবু আমেরের পর মুশরিকদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি যে উটে আরোহিত ছিল, সে দল থেকে বেরিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে। সকলে তার দিকে মনোযোগী হয়। এমনকি সে তিন বার (মুসলমানদের উদ্দেশ্যে) চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। তখন হযরত যুবায়ের (রা.) দল থেকে বেরিয়ে তার দিকে অগ্রসর হন আর খুব জোরে লাফ দিয়ে উটে আরোহিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে তার ঘাড় চেপে ধরেন। উটের ওপরেই দুজনের ধস্তাধস্তি হয়। মহানবী (সা.) বললেন, এদের মধ্যে প্রথমে যে মাটি স্পর্শ করবে সে নিহত হবে। ইতঃমধ্যে সেই মুশরিক উট থেকে নীচে পড়ে যায়, তার ওপর হযরত যুবায়ের (রা.) লাফিয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ সেই মুশরিককে হত্যা করেন। মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)'র প্রশংসা করেন এবং বলেন, প্রত্যেক নবীর

হাওয়ারী থাকে; আমার হাওয়ারী হলো 'যুবায়ের'। তিনি (সা.) আরো বলেন, 'এই মুশরিকের সাথে মোকাবেলা করার জন্য যদি যুবায়ের অগ্রসর না হতো তাহলে আমি স্বয়ং বের হতাম।' যখন মানুষজনের মধ্যে সংঘাত আরম্ভ হয় আর একে অপরের কাছাকাছি আসা শুরু করে তখন হিন্দা বিনতে উতবা মহিলাদের সাথে গিয়ে দাঁড়ায় আর মহিলারা দাফ বাজাতে আরম্ভ করে। তখন হিন্দা কবিতা আবৃত্তি করে বলে, 'দেখো! হে বনু আব্দুদ্ দার দেখো! নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষাকারীরা! সম্মুখে অগ্রসর হও আর তরবারির নৈপুণ্য প্রদর্শন করো। আমরা হলাম সম্মানিত ব্যক্তিদের কন্যা'। সে এগুলো গাইছিল আর পঙক্তি পড়ছিল, 'আমরা কোমল গালিচায় পদচারণা করি, আমাদের গলা মণি-মুক্তা খচিত, আমাদের সিঁথিতে কস্তুরী। যদি তোমরা সামনে অগ্রসর হও তাহলে আমরা তোমাদের বুকে জড়িয়ে নেব আর যদি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করো তাহলে আমরা তোমাদের প্রতি রুষ্ট হব। আর এই অবজ্ঞার জন্য আমাদের কোনো পরিতাপ হবে না।' সে তাদের আবেগকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করে। মহানবী (সা.) যখন এই পঙক্তিগুলো শোনেন তখন বলেন, **আল্লাহুম্মা বিকা আজুলু ওয়া বিকা আসুলু ওয়া ফিকা উশাতিলু- হাসবিয়াল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল**। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই প্রদক্ষিণ করি আর তোমার নামেই আমি আক্রমণ করি তোমার সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই জিহাদ করি। আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক! [এখানে তারা (অর্থাৎ কাফেররা) পার্থিব অবলম্বন ব্যবহার করছিল, এর বিপরীতে মহানবী (সা.) বলেন, আমাদের অবলম্বন একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।]

যাহোক, তখন উভয় দলের মধ্যে (রক্তক্ষয়ী) যুদ্ধ শুরু হয়। সেদিন লোকেরা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে এবং ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। আবু দুজানা আনসারী, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ, হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, আলী বিন আবু তালিব, আনাস বিন নাযার এবং সা'দ বিন রাবী রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীগণ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের ওপর নিজ সাহায্য অবতীর্ণ করেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখান। মুসলমানরা মুশরিকদেরকে তরবারি দিয়ে ব্যাপকভাবে হত্যা করে এমনকি তাদের সৈন্যবাহিনীকে বিতাড়িত করে। মুশরিকদের অশ্বারোহীরা মুসলমানদের ওপর তিনবার আক্রমণ করে। তখন প্রত্যেকবারই তাদেরকে তির নিক্ষেপ করে পিছু হটিয়ে দেয়া হয়। হযরত উমর (রা.) সেদিন নিজের ভাই যায়েদ (রা.)-কে বলেন, হে আমার ভাই! আমার বর্ম পরিধান করে নাও। তখন যায়েদ (রা.) বলেন, আমিও ঠিক সেভাবে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখি যেভাবে আপনি রাখেন। তাই উভয় ভাই বর্ম পরিধান করেন নি, অর্থাৎ শাহাদতের মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষায় বর্ম ছাড়াই যুদ্ধ করেছেন। সেদিন যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মহানবী (সা.) আনসারদের পতাকার নীচে বসে পড়েন আর আলী (রা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করেন যেন তিনি পতাকা নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। এতে আলী (রা.) সম্মুখে অগ্রসর হন এবং বলেন, 'আমি হলাম আবুল কাসম।' তখন মুশরিকদের কাতার থেকে এক ব্যক্তি বের হয়, সে ছিল তালহা বিন আবু তালহা; তার হাতে

মুশরিকদের পতাকা ছিল। কেননা, যুদ্ধে পতাকা বহন করার সম্মান বনু আব্দুদ্ দার গোত্রের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত ছিল। এছাড়া কুরাইশী পতাকা আব্দুদ দার গোত্রই প্রস্তুত করেছিল। তালহা বিন আবু তালহা প্রতিদ্বন্দ্বী আহ্বান করে আর বলে, কে আছে যে আমার সাথে মোকাবেলা করার জন্য আসবে? সে কয়েকবার মুসলমানদেরকে চ্যালেঞ্জ দেয় কিন্তু কেউই তার মোকাবেলায় বের হয় নি। পরিশেষে তালহা উচ্চৈঃস্বরে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথিরা! তোমরা তো বিশ্বাস রাখো যে, তোমাদের নিহতরা অর্থাৎ শহীদরা জান্নাতে প্রবেশ করে আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে যায়। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে, সে বলেছিল, হে মুহাম্মদের (সা.) সঙ্গী-সাথিরা! তোমরা বিশ্বাস করো যে, আল্লাহ্ তা'লা দ্রুতই তোমাদের তরবারির মাধ্যমে কেটে আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন আর তোমাদেরকে আমাদের তরবারির মাধ্যমে নিহত করে তাৎক্ষণিক জান্নাতে প্রবেশ করান। তাই তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমাকে নিজ তরবারির মাধ্যমে অতি দ্রুত জাহান্নামে পৌঁছে দিবে অথবা অতি দ্রুত আমার তরবারির মাধ্যমে নিজে জান্নাতে পৌঁছবে?! সে উস্কানি দেওয়ার চেষ্টা করে। বলতে থাকে, লাত ও উয্যার কসম! তোমরা মিথ্যাবাদী। যদি তোমরা নিজেদের বিশ্বাসে অটল থাকতে তাহলে নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ এই সময় আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে আসত। এটি শুনে হযরত আলী (রা.) তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে গেলেন। দুজনের মাঝে তরবারির আঘাত-পাল্টা আঘাত আরম্ভ হয়ে যায় আর হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে উভয় সেনাদলের মধ্য হতে এই দুজন একে অপরের মুখোমুখি হয়। হঠাৎ হযরত আলী (রা.) তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে ধরাশায়ী করেন; তার পা কেটে ফেলেন এবং তাকে ভূপাতিত করেন। এর ফলে তার লজ্জাস্থান প্রকাশ পেয়ে যায়। সে সময় তালহা বলে ওঠে, হে আমার ভাই! আমি খোদার দোহাই দিয়ে তোমার কাছে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছি। একথা শুনে হযরত আলী (রা.) সেখান থেকে ফেরত আসেন এবং তার ওপর আর আক্রমণ করেন নি। এতে কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেন তাকে হত্যা করেন নি? হযরত আলী (রা.) বলেন, তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং সে আমার দিকে মুখ করে ছিল, এতে তার প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হয়, আর আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, তুমি তাকে কেন ছেড়ে দিলে? হযরত আলী (রা.) নিবেদন করেন, সে খোদার দোহাই দিয়ে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা চেয়েছিল। তিনি (সা.) বললেন, তুমি তাকে হত্যা করো। সে অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন। মুশরিকদের পতাকাবাহীর নিহত হওয়া মহানবী (সা.)-এর এই স্বপ্নের সত্যায়ন ছিল যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি একটি ভেড়ায় আরোহিত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) আনন্দিত হন এবং উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আকবর বলে উঠলেন। মুসলমানরাও আল্লাহু আকবর বললো আর মুশরিকদের ওপর এত কঠিন আক্রমণ করলো যে তাদের সারিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সাহাবীরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে

শত্রুদের তরবারি দ্বারা ছিন্নভিন্ন করতে আরম্ভ করেন এমনকি তাদেরকে সামনে থেকে সরিয়ে দেন। তালহা নিহত হওয়ার পর মুশরিকদের পতাকা তার ভাই আবু শায়বা উসমান বিন আবু তালহা নিয়ে নেয়। হযরত হামযা (রা.) তার ওপর আক্রমণ করেন, তার হাত কাঁধ থেকে কেটে ফেলেন। তার তরবারি তার কণ্ঠনালী পর্যন্ত কেটে ফেলে। হযরত হামযা (রা.) তাকে হত্যা করার পরে এই কথা বলে ফেরত আসেন, আমি হাজীদের 'সাকী' (পানি সরবরাহকারী ব্যক্তি) আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র। এরপর মুশরিকদের পতাকা উসমান ও তালহার ভাই উঠিয়ে নেয় যার নাম ছিল আবু সাঈদ বিন আবু তালহা। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তার দিকে তির নিক্ষেপ করেন যা তার বুকে বিদ্ধ হয় আর এভাবে তাকেও হত্যা করেন। এরপর তালহা বিন আবু তালহা, যাকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করেছিলেন, তার পুত্র মুসাফেহ পতাকা হাতে নেয়; তখন হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.) তাকে তির নিক্ষেপ করেন আর সে ব্যক্তিও নিহত হয়। এরপর মুসাফেহ'র ভাই হারস্ বিন তালহা পতাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। এতে হযরত আসেম (রা.) তির নিক্ষেপ করে তাকেও হত্যা করেন। তালহার এই দুই পুত্র মুসাফেহ ও হারস্-এর মা-ও মুশরিক সেনাদলে ছিল। সেই নারীর নাম ছিল সালাফা। হযরত আসেম (রা.)'র তির যাকে বিদ্ধ করত সে-ই আহত হয়ে তার কাছে ফিরত এবং মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত। সালাফা বলত, কে তোমাকে আহত করেছে? পুত্র উত্তরে বলত, আমি সেই ব্যক্তির আওয়াজ শুনেছি, সে আমাকে তির নিক্ষেপ করার পর বলেছিল, পারলে এটা সহ্য কর। আমি আবু আফলাহার পুত্র। তার মা মানত করে, যদি আসেম বিন সাবেতের মাথা আমার হস্তগত হয় তাহলে আমি এতে মদ পান করব। সে ঘোষণা দেয়, যে ব্যক্তি আসেম বিন সাবেতের কর্তিত মাথা আমার কাছে আনবে আমি তাকে একশ উট পুরস্কার দিব। কিন্তু হযরত আসেম (রা.) উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি। রাজী'র অভিযানে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এই দুই ভাইয়ের নিহত হওয়ার পর তাদের তৃতীয় ভাই কিলাব বিন তালহা পতাকা বহন করে যাকে হযরত যুবায়ের (রা.) হত্যা করেন। এক উক্তি অনুযায়ী কুযমান তাকে হত্যা করেছিলেন। এরপর তার ভাই জুলাস বিন তালহা পতাকা তুলে নেয়। তাকে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) হত্যা করেন। এভাবে এই চার ভাই অর্থাৎ মুসাফেহ, হার্স, কিলাব এবং জুলাস নিজ পিতা তালহার ন্যায় সেখানেই নিহত হয়। তাদের সাথে তাদের দুই চাচা উসমান এবং আবু সাঈদও সেদিন অর্থাৎ উহুদের যুদ্ধের দিন নিহত হয়। তাদের নিহত হওয়ার পর কুরাইশদের পতাকা আরতাহ্ বিন শুরাহবিল ওঠায়। তাকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করেন। এক ভাষ্য অনুসারে তাকে হযরত হামযা (রা.) হত্যা করেছিলেন। এরপর শুরাহ্ বিন কারেয পতাকা ধরলে সে-ও মারা পড়ে, কিন্তু তার হত্যাকারীর নাম জানা যায় নি। এরপর এই পতাকা আবু যায়েদ বিন আমর তুলে নেয়। তাকে কুযমান হত্যা করেন। এরপর শুরাহবিল বিন হাশেমের পুত্র পতাকা উচ্চকিত করে। তাকেও কুযমান হত্যা করেন। এরপর তাদের দাস সাওয়াব পতাকা তুলে নেয়। এই ব্যক্তি হাবশি ছিল। সে লড়াই অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে তার হাত কাটা পড়লে সে

তৎক্ষণাৎ বসে গিয়ে নিজ বুক ও কাঁধের সাহায্যে পতাকা আগলে রাখে। পরিশেষে তাকেও কুযমান হত্যা করেন। এক উক্তি অনুসারে তার হত্যাকারী হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আরেক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (রা.) ছিলেন। যাহোক, সকল পতাকাবাহী যখন নিহত হয় তখন মুশরিকরা পরাজিত হয়ে পালাতে আরম্ভ করে আর তাদের মহিলারা তাদের ধ্বংসের বদদোয়া করতে থাকে। {মহানবী (সা.) স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন যে, পতাকাবাহীরা নিহত হবে– তারা সবাই নিহত হয়।} মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করছিল, এমনকি তাদেরকে সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কুরাইশ সেনাদলের সাথে আগত মহিলারাও পালাতে আরম্ভ করে। এর ফলে কুরাইশদের পরাজয়ের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। মুসলমানরা মুশরিক সেনাদলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ একত্রিত করতে আরম্ভ করে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এ সম্পর্কে লিখেন, কুরাইশ সেনাদল থেকে সর্বপ্রথম আবু আমের এবং তার সাথিরা সামনে আসে। সে অওস গোত্রভুক্ত এবং মদীনার বাসিন্দা ছিল। সে রাহেব (সন্ন্যাসী) নামে সুপরিচিত ছিল। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের কিছুকাল পর এই ব্যক্তি হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে নিজের কিছু সঙ্গী-সাথিসহ মক্কা চলে যায় আর মহানবী (সা.) এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশদের উত্তেজিত করতে থাকে। সে উহুদের যুদ্ধের সময় কুরাইশদের সাহায্যকারী হিসেবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এটি একটি অদ্ভুত বিষয়, আবু আমেরের পুত্র হানযালা (রা.) একজন পরম নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধে ইসলামী সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পরম বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হন। আবু আমের যেহেতু অওস গোত্রের প্রভাবশালী লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাই তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল– যেহেতু দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের পর আমি মদীনাবাসিদের সামনে উপস্থিত হবো তাই তারা আমার ভালোবাসায় অনতিবিলম্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পরিত্যাগ করে আমার সাথে মিলিত হবে। এই আশায় আবু আমের নিজ সঙ্গীদের নিয়ে সর্বপ্রথম সামনে অগ্রসর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলে, হে অওস গোত্রের সদস্যরা! আমি আবু আমের। আনসাররা সমস্বরে বলে ওঠেন, দূর হ হে পাপিষ্ঠ! তোর চোখ যেন কখনো শীতল না হয়। একই সাথে এমনভাবে একঝাঁক পাথর নিক্ষেপ করেন যে, আবু আমের ও তার সঙ্গীরা দিশাহারা হয়ে যায় আর পশ্চাদমুখী হয়ে ছুটে পালায়। এই দৃশ্য অবলোকন করে কুরাইশের পতাকাবাহী তালহা প্রবল উত্তেজনা নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে চরম অহমিকার স্বরে প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাকে আহ্বান জানায়। হযরত আলী (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে দুই-চার আঘাতেই তালহাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেন। এরপর তালহার ভাই উসমান অগ্রসর হয় আর বিপরীত দিক থেকে হযরত হামযা (রা.) তার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নেমেই তাকে মেরে ধরাশায়ী করেন। কাফেররা এই দৃশ্য দেখে ক্রোধান্বিত হয়ে গণহামলা আরম্ভ করে। মুসলমানরাও তকবির ধ্বনি দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। বস্তুত উভয় সেনাদল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কুরাইশের পতাকাবাহী মারা যাবার পর উভয় বাহিনীর মাঝে তুমুল যুদ্ধ হয়

এবং ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে; উভয় পক্ষ থেকে দীর্ঘক্ষণ হত্যা ও রক্তপাত অব্যাহত থাকে। অবশেষে ইসলামী বাহিনীর সামনে কুরাইশ বাহিনী ধীরে ধীরে পিছপা হতে থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক উইলিয়াম ম্যুর লিখছেন,

মুসলমানদের জোরালো আক্রমণের সামনে মক্কাবাহিনীর পা দোদুল্যমান হতে থাকে। কুরাইশদের অশ্বারোহী দল বেশ কয়েকবার মুসলমান বাহিনীর বামবাহুর দিক থেকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই পঞ্চাশজন তিরন্দাজের তিরের আঘাতে তাদের পিছু হটতে হয়েছে যা মহানবী (সা.) বিশেষভাবে সেখানে তাদের মোতায়েন করিয়েছিলেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে উহুদের ময়দানে সেই একই বীরত্ব, সাহসিকতা এবং মৃত্যু ও বিপদের-আপদের প্রতি সেরকমই ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শিত হয়েছিল যা বদরের সময় তারা প্রদর্শন করেছিলেন। এটি একজন ইংরেজ লেখক লিখছেন। মক্কাবাহিনীর সারি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ছিল যখন আবু দুজানা নিজের শিরস্ত্রাণে লাল রুমাল বেঁধে তাদের ওপর আক্রমণ করছিলেন এবং মহানবী (সা.) প্রদত্ত তরবারি দ্বারা চারিদিকে যেন মৃত্যুপুরী রচনা করছিলেন। হামযা তার মাথায় উটপাখির পালকখচিত অবস্থায় সর্বত্র দৃশ্যমান ছিলেন। আলী তার লম্বা ও সাদা কাপড় নিয়ে এবং যুবায়ের তার উজ্জ্বল রঙের হলুদ পাগড়ি পরে ইলিয়াডের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের ন্যায় যেখানেই যেতেন শত্রুদের জন্য মৃত্যুবার্তা ও দুশ্চিন্তার বার্তা সাথে বহন করতেন। উইলিয়াম ম্যুর যে ইলিয়াডের কথা বলেছেন সেটি গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী; সেই গ্রীক কেচ্ছাকাহিনির বীরদের কথা বলেছেন যারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল। যাহোক, তিনি বলেন, এটি সেই দৃশ্য যেখানে পরবর্তীতে ইসলামী বিজয়াভিজানের বীরসেনানিরা লালিতপালিত হয়েছে।

বস্তুত যুদ্ধ হয় আর তুমুল যুদ্ধ হয় এবং দীর্ঘক্ষণ অস্পষ্ট ছিল যে, বিজয়ের পাল্লা কার অনুকূলে ঝুঁকবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে পরিশেষে কুরাইশদের পা দোদুল্যমান হতে থাকে আর তাদের সৈন্যদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের লক্ষণাবলি পরিলক্ষিত হয়। কুরাইশদের পতাকাবাহী একে একে মারা যায় এবং তাদের মাঝে প্রায় নয় ব্যক্তি পালাক্রমে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েছিল, কিন্তু সবাই একে একে মুসলমানদের হাতে নিহত হয় যেমনটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। অবশেষে সওয়াব নামক তালহার একজন হাবশি দাস বীরত্বের সাথে এগিয়ে এসে পতাকা হাতে নেয়, কিন্তু তার ওপরও একজন মুসলমান এসে আক্রমণ করে এবং এক আঘাতে তার উভয় হাত কেটে কুরাইশদের পতাকা ভূপাতিত করে। এদিকে সওয়াবের বীরত্ব ও স্পৃহা দেখুন! সে-ও সেই সাথে মাটিতে পড়ে যায় এবং পতাকাটিকে নিজের বুকের সাথে লাগিয়ে পুনরায় উড্ডীন করার চেষ্টা করে। অপরদিকে সেই মুসলমান যে পতাকা ভূপাতিত হবার মর্ম বুঝত– তরবারির আঘাতে সওয়াবকে সেখানেই হত্যা করে। এরপর কুরাইশদের মধ্য থেকে আর কারো পতাকা হাতে নেবার সাহস হয় নি। অন্যদিকে মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পেয়ে তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করে পুনরায় আক্রমণ করে এবং শত্রুদের অবশিষ্ট সারি ছিন্নভিন্ন ও ছত্রভঙ্গ করে সৈন্যবাহিনীর ওপারে কুরাইশদের মহিলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এতে মক্কার সেনারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকে এবং চোখের পলকে ময়দান খালি হয়ে যায়; এমনকি মুসলমানদের জন্য এতটাই প্রশান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, তারা গনিমতের মাল একত্র করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, যুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থনে স্বল্প সময়ের ভেতর সাড়ে ছয়শ মুসলমানের মোকাবিলায় মক্কার তিন হাজার সুদক্ষ সৈন্য পিছু হটে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া আরম্ভ করে। তখন পিছনের গিরিপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা তাদের নেতাকে বলে, এখন তো শত্রুরা পরাস্ত হয়েছে, এখন আমাদেরকেও জিহাদের পুণ্য লাভের সুযোগ দেয়া হোক। নেতা তাদেরকে এরূপ করতে বারণ করে এবং মহানবী (সা.)-এর কথা স্মরণ করায়। কিন্তু তারা বলে, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যা বলেছেন তা কেবল তাগিদ দেয়ার জন্য বলেছেন। নতুবা তার উদ্দেশ্য তো এটি হতে পারে না যে, শত্রুরা পিছু হটলেও তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই বলে তারা গিরিপথ অরক্ষিত ছেড়ে দেয় এবং যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ অবাধ্যতার কারণে কী পরিণাম হল সেটিও পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। আবু দুজানার তরবারি সম্পর্কে উইলিয়াম ম্যুর যা লিখেছেন সেটির বিস্তারিত বিবরণও রয়েছে। মহানবী (সা.)-এর তরবারি নিয়ে তার প্রতি সুবিচারকারী সাহাবী কে ছিলেন– এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উহুদের দিন একটি তরবারি হাতে নিয়ে বলেন, 'কে আমার কাছ থেকে এটি নেবে?' তখন সবাই হাত বাড়ায় এবং বলে, 'আমি নেব, আমি নেব!' তিনি (সা.) পুনরায় বলেন, 'কে এটির প্রতি সুবিচার করার শর্তে এটি নেবে?' হযরত আনাস (রা.) বলেন, তখন সবাই থমকে যায়। তখন হযরত সিমাক বিন খারশা আবু দুজানা বলেন, 'আমি এটির প্রাপ্য প্রদানের শর্তে নিচ্ছি।' হযরত আনাস বলেন, তিনি তরবারি নেন এবং মুশরিকদের মাথা ফাটিয়ে দেন; অর্থাৎ সেটির অধিকার আদায় করেন। এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত। ইবনে উতবা লিখেছেন, মহানবী (সা.) যখন তরবারি দেখান তখন হযরত উমর (রা.) সেটি চান, কিন্তু তিনি (সা.) তাকে উপেক্ষা করেন। অতঃপর হযরত যুবায়ের চান, তিনি (সা.) তাকেও না দিয়ে উপেক্ষা করেন। এজন্য তারা দুজন মনে মনে আক্ষেপ করেন। আরেক রেওয়ায়েতে রয়েছে, যুবায়ের তিন বার তরবারি চান। প্রতি বারই মহানবী (সা.) অস্বীকৃতি জানান। হযরত আলী (রা.) দাঁড়িয়ে সেটি নিতে চাইলে তিনি (সা.) বলেন, 'বসে পড়ো' অর্থাৎ তাকেও দেন নি। অপর রেওয়ায়েতে দেখা যায়, সে সময় যেসব সাহাবী সেই তরবারি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)-ও ছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে দেখা যায়, হযরত আবু দুজানা জিজ্ঞেস করেন, এর অধিকার কী? মহানবী (সা.) জবাবে বলেন, এটি দ্বারা কোনো মুসলমানকে হত্যা করবে না এবং এটি হাতে থাকা অবস্থায় কোনো কাফেরের মোকাবেলায় পলায়ন করবে না, অর্থাৎ বীরত্বের সাথে লড়াই করবে। তখন হযরত আবু দুজানা নিবেদন করেন, আমি এ তরবারি এর প্রতি সুবিচার করার শর্তে নিচ্ছি। মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু দুজানাকে তরবারি দেন তখন তিনি সেটি দিয়ে মুশরিকদের মাথা ফাটিয়ে দেন। তিনি তখন এ কবিতা পাঠ করেন,

انَا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيلِي ... وَنَحْنُ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ

أَلَّا أَقُومَ الدَّهْرَ فِي الْكَيُّولِ ... أَضْرِبُ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ

অর্থাৎ **'আমি সেই ব্যক্তি যার কাছ থেকে আমার বন্ধু অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যখন আমরা সাফা নামক স্থানে খেজুর গাছের পাশে ছিলাম এবং সেই অঙ্গীকারটি ছিল, আমি যেন সৈন্যদলের পেছনের সারিতে না দাঁড়াই এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের তরবারি দিয়ে শত্রুদের সাথে লড়াই করি।'** যাহোক, হযরত আবু দুজানা এটি নিয়ে গর্বভরে সৈন্যদলের মাঝে হাঁটতে থাকেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন,

إن هذه مشيةٌ يبغضُها اللهُ عزّ وجلّ إلا في هذا المقام

অর্থাৎ **'এটি এমন চলন যা আল্লাহ্ তা'লা অপছন্দ করেন কেবল এ স্থান ব্যতিরেকে'** অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া। অর্থাৎ তিনি যেভাবে হাঁটছিলেন তার কথা বলা হচ্ছে। হযরত আবু দুজানা (রা.)'র উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও সীরাত খাতামান নবীঈন (পুস্তকে) লিখেছেন, যখন মক্কার কুরাইশরা যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছিল তখন এ দৃশ্য দেখে কাফেররা রেগে গিয়ে গণহামলা করে বসে। (তখন) মুসলমানরাও তকবির ধ্বনি উচ্চকিত করে উভয় সৈন্যদল পরস্পর ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সম্ভবত সেই সময়ে মহানবী (সা.) তাঁর তলোয়ার হাতে নিয়ে বলেন, কে আছে যে এটি নিয়ে এর অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে? অনেক সাহাবী এই সম্মান লাভের আশায় নিজেদের হাত প্রসারিত করেন, যাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.) বরং রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি (সা.) কাউকে তা দেয়া হতে বিরত থাকেন আর একথাই বলতে থাকেন– কেউ কি আছে যে এর অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে পারবে? অবশেষে আবু দুজানা আনসারী (রা.) নিজের হাত সম্মুখে প্রসারিত করে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে দিন। তিনি (সা.) এই তলোয়ারটি তাকে দিয়ে দেন এবং আবু দুজানা সেটিকে হাতে নিয়ে দম্ভভরে সগৌরবে কাফেরদের দিকে অগ্রসর হন। মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে বলেন, খোদা এভাবে হাঁটা অপছন্দ করেন, কিন্তু এমন পরিস্থিতে অপছন্দ করেন না। হযরত যুবায়ের (রা.) যিনি সম্ভবত মহানবী (সা.)-এর তলোয়ার লাভের সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং নিকটাত্মীয়তার কারণে নিজের অধিকারও বেশি মনে করতেন– মনে মনে কষ্ট পেতে থাকেন আর ভাবেন যে, মহানবী (সা.) আমাকে তরবারি না দিয়ে আবু দুজানাকে দেবার কারণ কী! আর তার এই অস্থিরতা দূর করার জন্য তিনি মনে মনে অঙ্গীকার করেন যে, আমি এই (যুদ্ধের) প্রান্তরে আবু দুজানার সাথে সাথে থাকব আর দেখব যে, ঐ তরবারি দিয়ে তিনি কী করেন? তিনি বলেন, আবু দুজানা নিজের মাথায় একটি লাল রঙের কাপড় বাঁধেন এবং সেই তরবারি নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসাগীত গাইতে গাইতে মুশরিকদের ব্যূহ ভেদ করে ঢুকে পড়েন। আমি দেখতে পেলাম যে, তিনি যেদিকেই যান যেন মৃত্যুপুরী রচনা করতে থাকেন। আমি এমন কোনো

মানুষকে দেখি নি যে তার সামনে এসে জীবিত ফেরত গেছে। এমনকি তিনি কুরাইশ সৈন্যদলের ভেতর দিয়ে রাস্তা করে নিয়ে সৈন্যদলের অপর প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে যান যেখানে কুরাইশদের মহিলারা দাঁড়িয়ে ছিল; আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা যে চিৎকার করে করে নিজেদের (সৈন্যদলের) পুরুষদেরকে (যুদ্ধের জন্য) উদ্দীপ্ত করছিল– তার সম্মুখে পৌঁছেন এবং আবু দুজানা (রা.) নিজের তলোয়ার হিন্দার ওপর ওঠালেন। হিন্দা সজোরে চিৎকার করে নিজ (সৈন্যদলের) পুরুষদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে কিন্তু কেউই তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। কিন্তু আমি দেখলাম, হযরত আবু দুজানা নিজেই নিজের তরবারি নামিয়ে নেন এবং সেখান থেকে চলে আসেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, সেই সেময় আমি আবু দুজানা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, প্রথমে তুমি তরবারি ওঠালে, আবার (নিজ থেকেই) নামিয়ে নিলে– এর রহস্য কী? তিনি বলেন, আমার মন এই বিষয়ে সায় দেয় নি যে, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তরবারি দিয়ে একজন মহিলাকে আঘাত করব। আর মহিলাটাও এমন যার সাথে সেই সময় কোনো পুরুষ রক্ষাকারী নেই। [এটি হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধের নীতি।] হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি তখন গিয়ে বুঝতে পারলাম, মহানবী (সা.)-এর তরবারির প্রতি সত্যিই তিনি সুবিচার করেছেন ।

সেই মহিলার ওপর তরবারি উঠিয়েও তিনি হত্যা কেন করেন নি– একজন সাহাবীর এই প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিষয়টির উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, (সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে) হযরত আবু দুজানা বলেন, আমার মন সায় দেয় নি যে, আমি মহানবী (সা.) প্রদত্ত তরবারি দিয়ে একজন দুর্বল নারীকে আঘাত করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) সর্বদা মহিলাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিতেন, যার কারণে কাফেরদের মহিলারাও অনেক ধৃষ্টতার সাথে মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করত। অর্থাৎ এই ঘটনা এজন্য সংঘটিত হয়েছিল যে, তিনি (সা.) (নারীদের) সম্মানের শিক্ষা প্রদান করতেন আর এ কারণেই মহিলারা বেশি ধৃষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করত, কিন্তু তারপরও মুসলমানরা সহ্য করতেন। অতএব, এটিই হচ্ছে ইসলামী যুদ্ধের নীতি। অবশিষ্ট বর্ণনা আগামীতে করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

ফিলিস্তিনীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। অত্যাচারের মাত্রা দিনের পর দিন চরম রূপ ধারণ করছে। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন এবং অত্যাচারিত ফিলিস্তিনীদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন। (আল্লাহ্ তা'লা) মুসলমান দেশসমূহকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন যেন তারা ঐক্যবদ্ধ হয় এবং মুসলমান ভাইদের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট হয়।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)